আমার এই লিখাটি কেবলই কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি ভাইদের উদ্দেশ্যে

ভাই মোহাম্মদ মাসিউল্লাহ

প্রিয় ভাই,
তোমার বড় সৌভাগ্য তোমার সোনালী ছাত্রজীবনেই দাওয়াতের কাজের মতো এক হীরার টুকরো মেহনতের সন্ধান পেয়েছো। তুমি এ নিয়ামতের কদর করো। আমিও তোমার মতো এই পথেরই পথিক। ছাত্রজীবনের প্রারম্ভে রাব্বে কারীম আমাকেও নসীব করেছিলেন এই মেহনতে জুড়ার।আজ আল্লাহর মেহেরবানিতে প্রায় উনিশ বছর হয়ে চললো আমার এই পথচলা।
এই বিপদসংকুল পথের বাঁকগুলো অতিক্রম করে এসেছি বলে রাস্তার হাল হাকীকত কিছুটা হলেও চেনা। আমার এই লিখা যদিও তোমাকে সম্বোধন করে লিখছি, বাস্তবে সম্বোধিতদের মাঝে আমিও আছি। কারন আমাকে এই মেহনত মুহতাজ বনে চলা শিখিয়েছে। এই মেহনতে প্রতিটি কথা বলা, প্রতিটি কথা শুনা, এই রাস্তায় প্রতিটি কদম, প্রতিটি সফর নিজেকে সামনে রেখে।
من جاهد فإنما يجاهد لنفسه.
যে সাধনা করে, সে নিজের জন্যেই সাধনা করে।
ভাই, তোমার সেই অতীতের কথা কি মনে পড়ে, যেদিন তুমি দ্বীন থেকে গাফেল ছিলে? যেদিন মসজিদে আযান হতো, অথচ মসজিদে না যাওয়ার কারনে তোমার মনে কোন আফসোস অনুভূত হতো না?
আজ এই মেহনতের বরকতে তুমি তোমাকে চিনেছ। নিজেকে এখন তোমার মুনাফিক মনে হয়। নিজের অনেক খারাবির কথা ভেবে তুমি পেরেশান হও। নিজেকে আর আগে বাড়াতে পারছো না বলে তোমার আফসোস হয়। হয়তো অনেক সময় তুমি ইহাও ভাবো, তাবলীগের কাজ করে তোমার আর ইসলাহ হচ্ছে না। কখনও কখনও নিজের উপর পেরেশান হয়ে ইসলাহের জন্য অন্য কোন পথ বা মতও তুমি হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকো।
অথচ তুমি একটু খেয়াল করে দেখো তো, যখন তুমি ঠিকমতো নামাজও পড়তে না, তখনও নিজের ইসলাহের জন্য কোন আফসোস তোমার মনে আসতো না। তুমি শোকরিয়া আদায় করো, এই যে নিজের মধ্যে দূর্বলতা অনুভব করা ইহাই ঈমানের আলামত। ক্রমাগত দাওয়াতের মেহনত করার বরকতেই এই নূর তোমার মাঝে তৈরি হয়েছে। অথচ শয়তান তোমাকে এই বলে ধোকা দিচ্ছে এই মেহনত করে তোমার আর অগ্রগতি হচ্ছে না।
তুমি কি জানো, মাত্র কিছুদিন কাজে না জুড়লে এই আফসোসটুকুও তোমার থাকবে না? তোমার অগ্রগতি হয়তো তুমি বুঝতে পারছো না। মেহনত না করলে যে দ্রুত পতন হয় তা কিন্তু সহজে বুঝা যায়। তাহলে বুঝে নাও, দুদিন কাজে না জুড়লেই যখন তোমার অধঃপতন হয়, নিঃসন্দেহে প্রতিদিনের মেহনতের দ্বারা তোমার তরক্কী হচ্ছে, যদিও তা তুমি অনুভব করতে পারছো না। মনে রেখ, নিজের তরক্কী উপলব্ধি করতে না পারা এটিও একটি নিয়ামত। আমাদের রব আমাদের হেফাজতের জন্যই অনেক সময় আমাদের উপলব্ধির উপর পর্দা ঢেলে দেন, যেন মন অহংকারী হয়ে না উঠে।
মেহনত যখন সহীহ হয়, তখন নিজের ইসলাহের ফিকর অন্তরে বজায় থাকে। আর যখন মেহনত গলদ হয়, নিজেকে পরিশুদ্ধ মনে হতে থাকে। তোমার যেহেতু নিজের উপর আফসোস হচ্ছে, শোকরিয়া আদায় করো, এক হক মেহনতের সাথে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সহীহভাবে জুড়ার তৌফীক দিয়েছেন। সুতরাং এই মেহনত যখন তোমাকে তোমার দূর্বলতা ধরিয়ে দিচ্ছে, ইয়াকীন করো, সে দূর্বলতা এই মেহনত করতে করতেই দূর হবে ইন শা আল্লাহ।
চলবে
(মারকাজের পথে চলেছি, রাস্তা খুব জ্যাম, তাই এই সুযোগে তোমাকে সম্বোধন)

কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি ভাইদের উদ্দেশ্যে (২)

প্রিয় ভাই,
গতকাল আলোচনা করছিলাম মেহনতের মাধ্যমে নিজের তরক্কী অনুভূত না হওয়ার কারন প্রসংগে। বলছিলাম, অনেক সময় আল্লাহ তায়ালাই আমাদের হেফাজতের জন্য তরক্কীর উপর পর্দা ঢেলে দেন। তরক্কী অনুভূত না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, একজন সাথী যখন প্রথম কাজে লাগে, সে তো একপ্রকার শুন্য থেকে শুরু করে। আগে নামাজ পড়া হতো না, এখন নামাজ পড়া হয়। আগে দাঁড়ি ছিল না, এখন মা শা আল্লাহ সুন্দর দাঁড়ি এসেছে। আগে গুনাহকে গুনাহই মনে হতো না, এখন মা শা আল্লাহ গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফীক হয়। তো, প্রথম দিকের আগে বাড়া ছিলো এমন যেমন একটা খালি গ্লাসে পানি ভরতে থাকা। এটা তো একদম স্পষ্ট দেখা যায়, গ্লাসে ধীরে ধীরে পানি বাড়ছে।কিন্তু যখন সাথী মা শা আল্লাহ মোটামুটি আমলের একটা স্ট্র্যাকচারের উপর উঠে গেছে। এরপর আগে বাড়ার যে স্টেজ শুরু হয়, সেটি হলো গুনগত দিক দিয়ে আগে বাড়া। যেমন কিনা গ্লাসভর্তি পানিকে চিনি মিশিয়ে শরবত বানানো। তো স্বাভাবিক ভাবেই পানি যে শরবতে পরিণত হচ্ছে তা তো বাহির থেকে দেখা যায় না। ঠিক এমনই গুনগত আগে বাড়াটা বাহির হতে অনুভূত হয় না। আগে ছিল কেবল নামাজী হওয়ার মেহনত, যা অনেকটা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসার মতো। এখন হচ্ছে নামাজে খুশুখুযু পয়দা করার মেহনত। আগে ছিল আমল বাড়ানোর মেহনত, এখন চলছে আমলে ইখলাস আনার মেহনত। তো স্বাভাবিক ভাবেই গুনগত তরক্কী যেটি, সেটি হতে সময় লাগে। আর বাস্তব কথা হচ্ছে, প্রথম স্টেজে উঠার জন্য যে পরিমাণ কোরবানি লাগে, দ্বিতীয় স্টেজে আগে বাড়ার জন্য আরও বেশি কোরবানি করতে হয়। আর এটিই সাধারণত বেশি হয়, কোরবানি আগের চেয়ে কমে গেছে। মেহনত অনেকটা আদত বনে গেছে। প্রথমদিকে নানাজন নানা কথা বলতো, ফলে দিলে আঘাত লাগতো, এখন মানুষও আগের মতো কথার ছোবল হানে না। সর্বদিক দিয়ে কোরবানি কমে আসে। ফলে কোরবানি না বাড়ার কারনে অগ্রগতি ধীর হয়ে পড়ে। যেটাকে তুমি ভাবতে থাক, কই মেহনতের দ্বারা আর তো ইসলাহ হচ্ছে না। বাস্তবে কিন্তু এখনও আগে বাড়ছো, কিন্তু অনুভব হচ্ছে না।
কাজেই হতাশ হওয়ার কিছু নেই।মেহনত করতে পারা, আমলের উপর টিকে থাকতে পারা এটিও এক ধরনের তরক্কী।

কলেজ ও ভার্সিটি অধ্যয়নরত তাবলীগি ভাইদের উদ্দেশ্যে ৩

প্রিয় ভাই,
যদিও তোমাকে উপলক্ষ বানিয়েছি, কথাগুলো আসলে নিজেকেই বলা। কারন আমি নিজেই তো সবচেয়ে বেশি মুহতাজ। আজ আমি বলতে চাই কেন তোমার ও আমার জন্যে তাবলীগের কাজই বেশি কার্যকরী। অন্য কোন পথ ও পন্থা কেন তোমার ও আমার ইসলাহের জন্য দাওয়াতের মেহনতের বিকল্প নয়।
দেখো, প্রতিমাসে তিনদিন লাগিয়ে যখন তুমি ফের, সেই মূহুর্তে অন্তরে যে পবিত্রতা তুমি অনুভব কর, বলো তার কোন তুলনা হয়? কিংবা বৎসরের নিসাবী চিল্লা দিয়ে যখন ফিরতি হেদায়াত নিয়ে তুমি কাকরাইল থেকে রওয়ানা করো, সেই মূহুর্তের ঈমানের স্বাদ তুমি আর কোথাও পেয়েছ? বলো, যে সমুদ্র দেখেছে, সে কি কোন কুয়া দেখে সন্তুষ্ট হবে? প্রতিমাসে চারটা শবগুজারী, মাসে একবার বাহাত্তর ঘন্টা একটানা দাওয়াতের ময়দানে কাটানো, মাসে টোটাল আটটা উমুমী গাশত, ষাটটি তালীম, প্রতিদিন আড়াই ঘন্টা ঈমানের দাওয়াত দেয়া, এর সাথে প্রতিদিনের তাসবীহাত ও তেলাওয়াতে তোমার তরক্কী না হয়, তবে আর কোন অযীফায় তোমার উন্নতি হবে?
আমি তো মনে করি না, তোমার মতো এক ছাত্রকে কোন শায়খ এর চেয়ে শক্তিশালী কোন অযীফা দেবেন। তুমি যদি কোন শায়খের হাতে বায়আত ও কিছু অযীফা আদায়কেই ইসলাহ বুঝো, তাহলে কিন্তু সঠিক বুঝো নি। বরং ইসলাহ চার জিনিসের নাম।

দ্বীনের গুরুত্ব অন্তরে বসে যাওয়া, শরীয়তের উপর ইস্তিকামাত হাসিল হওয়া, প্রতিটি আমলে মর্তবায়ে ইহসান অর্জন করা, প্রতিটি কাজে ইখলাস নসীব হওয়া - এ চার বস্তুর নামই ইসলাহ। মুফতিয়ে আজম ফয়জুল্লাহ রহঃ তা'ই বলেছেন। তুমি যে তরিকায় মেহনত করো না কেন, তোমাকে সাধনা করতেই হবে।
لقد خلقنا الإنسان في كبد.
আমি মানুষকে সাধনা নির্ভর করে বানিয়েছি।
আল্লাহ তায়ালা এ কথা কসম খেয়ে বলেছেন।
তুমি যদি মনে করো, কোন শায়খ তাঁর সীনা থেকে তোমাকে কিছু দিয়ে দেবেন আর তুমি বিনা সাধনায় অনেক উচ্চতায় পৌঁছে যাবে, তবে তুমি ভুল বুঝেছ। এক ব্যক্তি হজরত আশরাফ আলী থানবী রহঃকে বলল, হজরত, আপনার সীনা থেকে কিছু দিয়ে দিন। হাকীমুল উম্মত বললেন, আমার সীনায় কিছু কফ আছে, চাইলে নিতে পারো।
হজরত বুঝাতে চাইলেন, কিছু হাসিল করতে হলে তোমাকে সাধনা করতে হবে। বিনা সাধনায় হাসিল করার কোন শর্টকাট রাস্তা নেই।
তুমি বা আমি এখনও দাওয়াতের পথের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। মানুষ আমাদের টুপি দাঁড়ি দেখে আমাদের ব্যাপারে অনেক উঁচু ধারনা করলেও তুমি ও আমি তো জানি, আমরা কত অপরিপক্ব। এখন মাত্র মেহনত শেখার সময়। কাজেই অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভালভাবে এই মেহনতই করতে হবে। আমরা আমাদের চিকিৎসার জন্যে দাওয়াতের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। দেখো নি, মানুষ যখন কোন হাসপাতালে ভর্তি হয় কেবল হাসপাতালের প্রেশক্রিপশনই চলে, আগের সমস্ত বিশেষজ্ঞদের ট্রিটমেন্ট বন্ধ করে দেয়া হয়। কাজেই এই প্রেশক্রিপশন অনুসরণ করলেই কেবল আমাদের সুস্থতা আশা করা যায়।
আর তুমি যে প্রতিষ্ঠানে আছো, ঐ প্রতিষ্ঠানের হাল হাকীকত তোমার ওখানকার সিনিয়র ভাইগনই ভালো বুঝবেন। কাজেই ওখানে নিজেদের হালতের উপর যে মুজাকারা হয়, সেটিই তোমার জন্যে বেশি ইফেক্টিভ। কারন ঐ মুজাকারা কিন্তু অনেক দিনের অভিজ্ঞতার ফসল। তোমার এই প্রতিষ্ঠানের হালতের উপর যুগ যুগ ধরে তোমার সিনিয়রগন যেভাবে মেহনত করেছেন তার সারাংশই তোমার সামনে পেশ করা হয়। এ কথা বললে বাড়াবাড়ি হবে না, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শায়খও যিনি এখানকার হালত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন, তিনিও তোমার জন্যে এর চেয়ে ভাল প্রেশক্রিপশন দিতে পারবেন না।
তুমি তোমার প্রতিষ্ঠানের জামাতের পরামর্শে চলতে থাকো। তুমি একা এখানে অন্য কোন শায়খের পরামর্শে চললেও হোচট খাওয়ার সম্ভাবনা।
কারন জামাতের সাথে থাকা রহমত, জামাত থেকে আলাদা হওয়া আযাব।
তাই বুঝে বুঝে তুমি সাবধানে চলো। একা চলতে গেলেই তুমি পথ হারাবে।

কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি ভাইদের প্রতি ৪

প্রিয় ভাই,

এটি তোমাকে লিখা আমার চতুর্থ পোস্ট। আমি জানি, এক বৈরী পরিবেশে তুমি দ্বীনের উপর চলার চেষ্টা কর। একজন মাদ্রাসা ছাত্র কখনও তোমার এ মুজাহাদা কল্পনা করতে পারবে না। সবার চেয়ে ভিন্ন পোষাকে, ভিন্ন অবয়বে এখানে তোমাকে চলতে হয়। তাই বলে তুমি কি নিজেকে আনস্মার্ট ভাবো?
নিশ্চয় তুমি নতুন ফ্যাশনের শার্ট গায়ে দেয়া, প্রতিদিন শেভ করে নিজের চেহারাকে মসৃন করে রাখা, আর হাল ফ্যাশনের স্টাইলিশ চুল রাখাকে স্মার্টনেস ভাবো না। প্রথম যেদিন তিনদিন লাগিয়েছ সেদিনই তো তোমার ভুল ভাঙ্গার কথা। যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে জানে, সেই তো স্মার্ট।

তোমার বাতাসে উড়ে যাওয়া পাগড়ির শামলা, তোমার লম্বা জামা, তোমার চেহারার নূরানী দাঁড়ি, তোমার অবনত দৃষ্টি কতজনকে যে প্রভাবিত করে তুমি জানো না। এই যে পৃথিবীর মিথ্যা জৌলুসকে বুড়োো আঙ্গুল দেখিয়ে তোমার সুন্নাহর রঙে রঙিন হওয়া, তা অনেক দিলেই আফসোসের রক্তক্ষরণ ঘটায়। এক গাফেল পরিবেশে এই যে তোমার ফিকরমান্দ চলা, এ তো অনলাইনের হাজারো ইসলামিস্টের কলম জিহাদের চেয়ে লক্ষগুন শক্তিশালী।
তোমার যে বন্ধুকে ডাকলে এখনও মসজিদে আসে না, তার অন্তরেও তোমার জন্যে বিশাল ইজ্জত। আমার বাল্যবন্ধুদের কয়েকজন চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে পড়তো। আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগানোর সুযোগ তখনও তাদের হয় নি। তো তারা আমাকে প্রায়ই বলতো, ভার্সিটিতে যখন দু'পক্ষের মাঝে হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়, আমরা তালাশ করতে থাকি, তাবলীগের ভাইয়েরা কোন পথে যাচ্ছে। আমরা তাদের পিছু নিই। আমাদের বিশ্বাস, বন্দুকের গুলি সে পথে যাবে না। দেখো, তোমার ব্যাপারে তোমার দ্বীনবিমুখ ভাইদের কি ধারনা! অতএব, কখনোই হীনমন্যতায় ভূগো না। নিজেকে ছোট ভেবে চলো না। বরং এই ক্যাম্পাসে দ্বীনের দাওয়াতের জন্য তোমাকে সিলেক্ট করা হয়েছে ভেবে আনন্দিত হও। তোমার হাসিমুখে একটা সালাম, তোমার একটু মুসাফাহা কত অন্তরে যে আফসোস জাগাবে তার শেষ নেই। প্রতিদিনের একটা সালামও কারও না কারও দিল ঘুরিয়ে দিতে পারে। আরে আমি বাড়িয়ে বলছি না। এর পক্ষে কত কারগুজারি যে আছে কি বলবো।
নিজেকে তুমি ইমপর্টেন্ট ভাবা শেখো। এই ক্যাম্পাস বাস্তবে তোমার উপস্থিতির কারনেই নিরাপদ। নইলে অজস্র পাপের ছড়াছড়ি কত আযাব ডেকে আনতো। আল্লাহর নাফরমানির কারনে তোমার কপালের ভাঁজ, তোমার চোখের নীরব অশ্রু, হিকমতের সাথে বন্ধুকে তোমার ফেরানোর চেষ্টা, তোমার আল্লাহর জন্য ভাইয়ের প্রতি মহব্বত, তোমার শেষ রাতের নামাজ প্রতিনিয়তই শত আযাবকে ঠেকিয়ে রাখছে।
তোমাকে নববী ইফোর্টের জন্যে কবুল করা হয়েছে। এই মেহনতকে তোমার ইসলাহের জন্যে যথেষ্ট ভাবো। এটিই হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে কাজ করা। কোরআনের ভাষায় এর নামই বাসীরাত। মাওলানা সা'দ হাফিজাহুল্লাহ বলেন, এই অন্তর্দৃষ্টির সাথে দাওয়াতের কাজ করা - এটি আমার তরবীয়ত, ইসলাহ, হেদায়াত ও তায়াল্লুক মা'আল্লাহর জন্য যথেষ্ট, বরং সমস্ত মানুষের হেদায়াতও দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট - এ কথা মনে করাই দাওয়াতের কাজের বাসীরাত। হজরতজী মাওলানা ইলয়াস রহঃ একবার বলছিলেন, " হে ইউসুফ! তুমি ইয়াকীন করো, কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সমস্ত মানুষের হেদায়াত দাওয়াতের কাজের মাঝে লুকিয়ে আছে। "
তাহলে কেন তুমি এ কথা ভাবতে যাবে, দাওয়াতের কাজের দ্বারা তোমার সংশোধন হবে না? হজরতজী আরও বলতেন, মানুষ এ জন্য আমাদের এ কাজ করতে চায় না, তারা ভাবে, তাবলীগ মানে মানুষের নামাজ শুদ্ধ করা, কালিমার আলফায শুদ্ধ করা। তারা নিজের নামাজ ও কালিমা শুদ্ধ হওয়ার কারনে নিজেকে এ কাজের অমুখাপেক্ষী ভাবে। বাস্তবে কালিমার আলফায শুদ্ধ করা, নামাজ শুদ্ধ করা তো এ কাজের আলিফ- বা- তা। বরং ঈমান ও আমালের পরিপূর্ণতার সকল দরজা এ কাজের মাঝে বিদ্যমান। মানুষ ঈমান ও আমালের যত উঁচু জায়গায় পৌঁছতে চায়, দাওয়াতের কাজের দ্বারাই তা সম্ভব।

কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি ভাইদের উদ্দেশ্যে -৫

প্রিয় ভাই,

সম্বোধনেই বুঝে ফেলেছ তোমাকেই বলছি। আজ হজরতজী মাওলানা ইলয়াস রহঃ এর এক কারগুজারি তোমাকে শুনাবো। একবার এক জামাত মেহনত করে ফিরলো। তিনি হালত জানার জন্যে তাদের নিয়ে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সময় লাগিয়ে কি লাভ হলো তোমাদের? সাথীদের জবাবগুলো এমনই ছিলো,
-হজরত, আগে সুরা ফাতিহাটা শুদ্ধ করে জানতাম না, এবার আলহামদুলিল্লাহ শুদ্ধ করে নিলাম।
- হজরত, খাওয়ার সুন্নতগুলো এবারই বিস্তারিত শিখলাম।
- হজরত, পর্দার গুরুত্ব আমার ছিলো না। এবার মজবুত নিয়ত করে এসেছি।
- হজরত, কামাইয়ের ব্যাপারে স্বচ্ছতা ছিল না। এবার নিয়ত করেছি প্রয়োজনে উপোস থাকবো, কিছুতেই হারাম খাবো না।
হজরতজী বললেন, আমি তোমাদের পাঠিয়েছিলাম স্বর্ণকার হওয়ার জন্যে, তোমরা সবাই অলংকার বনে ফিরে এসেছ।
হজরতজী এই এক বাক্যে মেহনতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে দিয়েছেন। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সময় দিয়ে দ্বীনদার বনে গেল। কিন্তু তার মধ্যে এলো না দাওয়াতের জজবা, এলো না উম্মতের দরদ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাওয়াত দেয়ার অভ্যাস তার মাঝে গড়ে উঠল না। সে যেন অলংকার বনলো। কিন্তু তার হওয়া দরকার ছিলো স্বর্ণকার। স্বর্ণকার হাজারো অলংকার গড়তে জানে, আবার তালীম দিয়ে তৈরি করতে পারে স্বর্ণকারও। এক ব্যক্তি নিজে ইবাদতগুজার হলো। কিন্তু তার ইবাদত তো অন্যকে ইবাদতগুজার বানাবে না। যেমন অলংকারের পরশে অলংকার তৈরি হয় না। অলংকার তো গড়ে উঠে স্বর্ণকারের হাতের পরশে।
কাজেই তুমি খুব করে ভেবে দেখো, তুমি দাঈ হয়েছো কিনা। তুমি হয়তো মাসে তিনদিন লাগাও, সাপ্তাহিক গাশত তোমার মিস হয় না। শবগুজারীও নিয়মিত করো। কিন্তু তোমার মাঝে দাওয়াতের জজবা তৈরি হয় নি। কোন ভাইয়ের দেখা পেলে তাকে কৌশলে দাওয়াত দেবার জন্যে তোমার ভেতরটা হা পিত্যেশ করে না। দাওয়াত দিতে না পারলে তোমার সবকিছু বিস্বাদ ঠেকে না। দাওয়াত দেবার জন্যে তুমি বাহানার আশ্রয় নাও না। যদি তাই হয়, বুঝে নাও তুমি কেবল অলংকার বনেছ। দাঈ তুমি বনতে পারো নি।
অথচ দাওয়াতের জজবাই তোমাকে দ্বীনের ক্ষেত্রে আগে বাড়াবে। ভাল করে খেয়াল করে দেখো, যে সাথীটা তিনদিন দিয়ে দাওয়াত দিতে শুরু করেছে। সে এখনও দাঁড়ি রাখতে পারে নি, জামার মধ্যে পরিবর্তন আসে নি। গুনাহও ছাড়তে পারে নি। কোন অসুবিধে নেই। তুমি অচিরেই দেখবে, সে যে সুযোগ পেলেই দাওয়াত দেয়, এই দাওয়াতই ধীরে ধীরে তাকে বদলে দেবে। কবে যে সে দ্বীনের উপর চলা শুরু করেছে, সুন্নাহর রঙে রঙিন হয়ে গেছে সে বুঝতেই পারবে না। দাওয়াতের এমন প্রভাব। যদিও বাহ্যিকভাবে মনে হয় দাওয়াত অন্যের জন্য। বাস্তবে দাওয়াত স্বয়ং দাঈকে প্রভাবিত করে, দাঈকে ভেতর থেকে পরিবর্তন করে দেয়। দাঈকে কোন আমলের জন্য তারগীব দিতে হয় না। কোন কাজের জন্য তাশকীল করতে হয় না।
দাওয়াতের প্রত্যক্ষ প্রভাবের চেয়ে পরোক্ষ প্রভাবই বেশি। একজন নামাজের দাওয়াত দিয়ে চলেছে। মাসের পর মাসের দাওয়াতে একজনও নামাজী হয় নি। কিন্তু দাওয়াতদাতা পাক্কা নামাজী বনে গেছে, জামাত তার ছুটে না, তাকবীরে উলা ছুটলে তার কান্না পায়। তার এ অবস্থা কেন জানো? কেবল দাওয়াতের তা'ছীর।
কাজেই কাউকে দ্বীনের উপর তুলতে চাইলে তাকে দাওয়াতের সাথে লাগিয়ে দাও। অন্ততঃ নামাজের দাওয়াত হলেও দিক। তার বর্তমান হালতে কিছু যায় আসে না। দ্বীনের ক্ষেত্রে সে যত পিছনে হোক কোন পরওয়া নেই। কেবল তাকে দাওয়াতের উপর তোল। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। তার দাওয়াতই সবকিছু করবে। কদিন পর তুমি দেখবে সে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে।
শয়তান তোমাকে কেন রোজানা দাওয়াত দিতে দেয় না বুঝতে পেরেছো? কারন সে ভালো করে জানে, তোমাকে পথ থেকে সরানোর জন্যে দাওয়াত থেকে সরানোই কাফী। ব্যস, কোনদিন যেন তোমার দাওয়াত দেয়া না ছুটে। দাওয়াতের এই রহস্য বুঝতে পারার মাঝেই এ কাজের বাসীরাত। খুব কম মানুষের সামনেই এ রহস্য উদ্ঘাটিত হয়।
মাওলা যেন দাওয়াতের কাজের রহস্য আমাদের সামনে সূর্যের মতো স্পষ্ট করে দেন। এ জন্য খুব চোখের পানি ঝরানো চাই।

কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি ভাইদের উদ্দেশ্যে -৬

প্রিয় ভাই,

আমি সাধারণ একজন তাবলীগের সাথী। এই মোবারক মেহনত নিয়ে ভাবতে গিয়ে যে চিন্তাগুলো মাথায় উঁকি দেয়, সেগুলোই তোমার সাথে শেয়ার করি। গাশতে কিংবা পুরোনো সাথীদের সাথে প্রতিদিনের মুজাকারায় যে কথাগুলো বলার তৌফীক হয়, সেগুলোই তোমাকে শুনিয়ে দিই। হয়তো এভাবে বলতে গিয়ে আমার ভাবনাগুলো এক জায়গায় জমা হবে, হয়তো কারও অন্তরে ছুঁয়েও যেতে পারে কোন মুজাকারা। হয়তো নতুন করে মেহনত শুরু করে দেবেন কোন ভাই। আমাদের সাধারনের জন্য এর চেয়ে সহজ কোন মেহনত আমি দেখি না। মাদ্রাসার তালীমের যে পদ্ধতি, ঐ পদ্ধতি এক বিশেষ শ্রেণীর জন্য। সবার পক্ষে সেখানে থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। কোন শায়খের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার মেজাজও সবার থাকে না। যার মধ্যে ইসলাহের তলব আসে নি, সে কোন শায়খের কাছে যাওয়ার চিন্তাই করবে না। বুজুর্গানে দ্বীনের সাথে হয়তো সম্পর্ক রাখবে কেবল দুনিয়াতে বরকত পাওয়ার জন্য। ব্যবসায় বরকত হওয়ার জন্য দোয়া করানো, ছেলের পরীক্ষা ভালো হওয়ার জন্য একটু ছেলের মাথায় ফু দেওয়ানো, রোগ ভালো হওয়ার জন্য পীর সাহেবের পানিপড়া নেয়া আজকাল এসব উদ্দেশ্যেই মানুষকে বুজুর্গদের সাথে সম্পর্ক রাখতে দেখা যায়। নিজের রুহানি তরক্কীর জন্য শায়খের সোহবতে যায় এমন মানুষের সংখ্যা শুন্যের কাছাকাছি। সবকিছুর মূলে কারন একটাই তলবের সমুদ্রে পানি শুকিয়ে গেছে। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে নক করা ছাড়া দ্বীনের জন্য তলব সৃষ্টি করা কঠিন। কোন মাহফিলে গিয়ে দ্বীনের কথা শুনতেও মানুষ আজ তৈরি না। এটিই বাস্তবতা। তাই নবীদের মেহনতের অনুসরণে মানুষের কাছে পৌঁছার বিকল্প নেই।

হজরতজী রহঃ তাই বলতেন, তালেবে ইলমকে ইলম শেখানো মাদ্রাসার কাজ। যার মধ্যে ইসলাহর তলব এসেছে, তাকে ইসলাহের সবক দেয়া খানকাহ'র কাজ। কিন্তু যার মধ্যে কোন তলব নেই, তার মাঝে তলব সৃষ্টি করা এটিই তাবলীগের কাজ।

যদি তলব শেষ হয়ে যায়, মাদ্রাসাগুলো পড়ানোর জন্যে ছাত্র পাবে না, খানকাহগুলো মুরীদ পাবে না। এজন্যই মুফতিয়ে আজম ফয়জুল্লাহ রহঃ বলেছেন, তাবলীগ হলো উম্মুল ফারায়েজ। যদি দাওয়াতের সমুদ্রে পানি থাকে, তালীম, তাযকিয়ার সমুদ্রেও পানি থাকবে।

তাই মানুষের দরজায় পৌঁছার বিকল্প নেই। নববী দাওয়াতের এটিই বৈশিষ্ট্য। তাঁরা মানুষের কাছে যেতেন। মানুষ চেহারা ঢেকে ফেলতো, কানে আঙ্গুল দিতো, মুখ ফিরিয়ে নিত। নবীগন তারপরও যেতেন। এজন্য গিয়ে দাওয়াত দেয়াই সুন্নতের সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি। কিতাব লিখা, দ্বীনি পোস্ট দেয়া এগুলোও দাওয়াতের প্রকার। কিন্তু যার মাঝে তলব আছে, সে এগুলো পড়বে। যার মাঝে কোন তলব নেই, সে ঠিকই এড়িয়ে যাবে। আর সামনাসামনি দাওয়াত দিলে শ্রোতার রেসপন্স সহজে বুঝা যায়। দূর থেকে কিছুই আঁচ করা যায় না। তাই কাছে গিয়ে তাশকীল করা জরুরী। তাকে পরিবেশে নিয়ে আসা জরুরী। তাবলীগের সাথীরা ইহাই করে থাকে। কেবল পৌঁছে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করে না। তাকে পরিবেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য তাশকীল করে।

তাশকীলই আমাদের মেহনতের স্বাতন্ত্র্য। তাই কেবল দাওয়াত দেয়া নয়, তাশকীলও করা চাই। সময়মতো উসুলও করা চাই। এছাড়া মেহনতের ফলাফল স্পষ্ট হবে না। মানুষ দ্বীন মানতে চায়। কিন্তু পরিবেশ তাকে সে সুযোগ দেয় না। সে দ্বীনের উপর চলতে ভয় পায়। ক্ষতির আশংকা করে। যখন সে আল্লাহর রাস্তায় এসে কিছুদিন দ্বীনের উপর চলে, তার সাহস হয়। নিজের পরিবেশেও দ্বীন মানতে হিম্মত করে। আগে যে মানুষটা নামাজ পড়তেই তৈরি ছিল না, সে এখন তাহাজ্জুদ ছুটলে কাঁদে। কেন এ পরিবর্তন? কেবলই পরিবেশে নিয়ে আসার প্রভাব।

ব্যস আজ এ পর্যন্তই।

কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি ভাইদের উদ্দেশ্যে -৭

প্রিয় ভাই,

আজ তোমার সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আলোচনা করবো। তোমার ইলম হাসিলের পদ্ধতি কি হবে সেটি খুবই গুরুত্ববহ প্রশ্ন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইলম হাসিলের সুযোগ তোমার হয় নি। ফলে ইলমের ক্ষেত্রে তোমার মাঝে বিরাট ঘাটতি রয়ে গেছে। ধীরে ধীরে তোমাকে এ ঘাটতি পূরণ করতে হবে। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে তুমি ইলম কার কাছ থেকে নেবে।

মাসায়েলে ইলমের ক্ষেত্রে আমাদের বড়গন কেবল এতটুকু বলেন, মাসায়েল ওলামায়ে কেরামের কাছে গিয়ে শিখতে হবে। কিন্তু নামেমাত্র আলেম হলেই, কিংবা কিছু মুখস্ত কোরআন হাদীস আওড়ালেই কি তুমি তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করবে? কাজেই নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তুমি অবশ্যই হজরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহঃ এর নীচের উক্তিটি সামনে রাখবে। তিনি বলতেন,

ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذوا دينكم.

নিশ্চয়ই এই ইলম হচ্ছে দ্বীন, সুতরাং তোমরা ভাল করে খেয়াল করে দেখো কার কাছ থেকে দ্বীন শিখছো।

কাজেই তোমাকে ভাল করে দেখতে হবে, এই ব্যক্তি থেকে দ্বীন শেখা আমার জন্য ঠিক হবে কিনা। প্রথম জামানায় কোন ব্যক্তির কাছ থেকে দ্বীন নেয়ার সময় দুটি জিনিস অবশ্যই দেখা হতো। দেখা হতো এই ব্যক্তি কতটুকু ন্যায়পরায়ণ, তার মাঝে তাক্বওয়া পরহেজগারি কতটুকু আছে, সে ব্যক্তিজীবনে কতটুকু দ্বীন মানে। এ বিষয়টিকে বলা হয় আদালাহ। দ্বিতীয় যে বিষয়টি তারা দেখতেন, এই ব্যক্তি দ্বীনের ইলম কতটুকু সংরক্ষণ করেছে। অর্থাৎ সে যা বলছে, তা কি সে ভালভাবে জেনে বলছে। বর্তমানে দেখতে হবে, সে যা পোঁছাচ্ছে তা সে ভাল করে রপ্ত করে তারপর বর্ণনা করছে কিনা।

তারা দেখতেন, তার এই বর্ণনা সনদের সাথে কিনা। অর্থাৎ তার এই ইলম সনদ পরম্পরায় অর্জিত কিনা। বর্তমান জামানায় দেখতে হবে, সে ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে দ্বীন শিখেছে, না নির্ভরযোগ্য উস্তাদের কাছে লম্বা সময় অতিবাহিত করে শিখেছে।

তারা এটিও দেখতেন, দ্বীনের এই ইলম তার কাছ থেকে আর কে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ সমসাময়িক আহলে ইলমের কাছে সে নির্ভরযোগ্য কিনা।

তুমি কোন ওয়েবসাইটে ক্লিক করে কোন ইনফরমেশন পেয়ে গেলে। সাথে সাথেই তা গ্রহন করে নিলে। তুমি জানলে না, এই ওয়েবসাইটের পেছনের ব্যক্তিটি কতটুকু ন্যায়পরায়ণ, তাক্বওয়ার বিচারে সে কতটুকু উত্তীর্ণ। সে আদৌ নির্ভরযোগ্য উস্তাদের সংস্রবে থেকে ইলম শিখেছে কিনা। কোন টিভি চ্যানেলে প্রোগ্রাম করতে পারাই কারও নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। কাজেই তোমাকে দ্বীন নেয়ার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ তোমার পূঁজি বড় কম। তোমার মাঝে যাচাই করার যোগ্যতা আসে নি। কোন পেইজে কোন লিখা পেয়ে গেলে, কোথাও কোন মাসআলা শুনলে, সাথে সাথে যাচাই না করে আমল করা শুরু করলে এমন যেন না হয়।

দ্বীনি কিতাব পড়ার ক্ষেত্রেও তোমাকে নীচের মূল্যবান কথাটি মনে রাখতে হবে। আল্লামা শাতেবী রহঃ তাঁর আল মুয়াফাকাত এ যথার্থই বলেছেন,

ان العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل الي الكتب وصارت مفاتحه بايد الرجال.

ইলম ছিল ওলামাগনের সীনায় সংরক্ষিত, তারপর তা স্থানান্তরিত হলো কিতাবে, কিন্তু তার চাবিসমূহ এখনও রয়ে গেছে ওলামাগনের হাতে।

কাজেই তুমি কখনই কিতাবকে আলিমের বিকল্প মনে করবে না। মাসায়েল অবশ্যই ওলামাগনের দরবারে সরাসরি গিয়ে হাসিল করবে। দ্বীনের ব্যাপারে কোন খটকা এলে নির্ভরযোগ্য আলিমের কাছে গিয়ে সন্দেহ দূর করে নেবে। মাসায়েল ফোনে জানার চেয়ে সরাসরি গিয়ে জানাই মুনাসিব।

মোটামুটি এ কথা পরিস্কার হতে হবে, কোন আলিমের কাছ থেকে মাসায়েল জানা যাবে, কার কাছ থেকে জানা যাবে না। কাজেই নির্ভরযোগ্য কোন মুত্তাকী মুফতি সাহেবের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে নাও। দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোতে গিয়ে মাঝে মাঝে ওলামা হজরতগনের কাছে গিয়ে ধর্ণা দাও। কারণ তুমি ইলমের জন্য তাদের মুহতাজ। তাদের সম্মান করা ব্যতীত ইলমের ঘ্রাণ তুমি কখনও পাবে না।

ব্যস, ইলম হাসিলের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আর একটি কথা, কখনও তোমার মাঝে এই জোশ আসতে পারে, সব ছেড়ে ছুঁড়ে কোন মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হয়ে যাই। খবরদার, বড়দের সাথে পরামর্শ ছাড়া কখনও তা করবে না। তুমি তোমার পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ইলম শিখে নিতে পারো। আর তুমি যা পড়ছো, তাও কিন্তু জরুরী। তাই এমন যেন না হয়, কোন ভুল সিদ্ধান্তের কারনে তুমি দুদিকই হারালে। তাছাড়া তোমার পরিবারের হালতও তোমার চিন্তা করতে হবে। তাদের দ্বীনের উপর উঠা কিন্তু তোমার ব্যালেন্সড মেহনতের উপর নির্ভরশীল।

কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি ভাইদের উদ্দেশ্যে -৮

প্রিয় ভাই,

তুমি কি কখনও এভাবে চিন্তা করো যে, ডিজিটালাইজেশনের এই যুগে কেন দ্বীন শেখার জন্যে এত কষ্ট করা, এখন কত সহজে মানুষ দ্বীন সম্পর্কে জেনে যাচ্ছে। কোন টিভি চ্যানেলের সামনে বসলে, কিংবা কোন ওয়েবসাইটে ক্লিক করলেই তো কতকিছু জানা যায়। কেন অহেতুক এত ঝামেলা করা, কেন এত কষ্ট করে ঘর ছেড়ে বের হওয়া? থাকার কষ্ট, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট!

ভাই, তুমি যদি কিছু জ্ঞান অর্জনকেই যথেষ্ট ভাবো, এটাকেই দ্বীন শেখা বুঝো, তবে তো মারাত্মক ভ্রান্তিতে তুমি নিপতিত। কোন বিষয় জেনে ফেলা, আর তা আমলে নিয়ে আসা দুটি একই জিনিস নয়। তুমি তোমার চারপাশে খেয়াল করলেই দেখবে, তোমারই পরিচিত বন্ধু তার ল্যাপটপে ঘন্টার পর ঘন্টা কোন স্কলারের লেকচার শুনে যাচ্ছে। শুধু তাই না, তোমাকে রীতিমতো এসব নিয়ে কটাক্ষপাতও করে। তোমার সেকেলে পদ্ধতির মেহনত নিয়ে হাসাহাসি করে। অথচ তুমি দেখবে, যখন মসজিদে আযান হয়, লেকচার শুনা বন্ধ করে মসজিদে যেতে তার ইচ্ছে করে না। সে ঘন্টার পর ঘন্টা তোমার সাথে বাহাস করতে রাজী হবে, কিন্তু একটু কষ্ট হবে, কিংবা মানুষ হাসাহাসি করবে অজুহাতে অনেক দ্বীনি কাজেই সে রাজী হবে না। সামান্য সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে তার কষ্ট লাগবে, আমল না করার জন্যে হাজারো যুক্তি সে খাড়া করবে। দেখবে তার বেশিরভাগ যুক্তি আমল না করার জন্যে।

ভালো করে বুঝে নাও, কিছু জ্ঞান হাসিল হওয়া আর হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া দুটি একই কথা নয়। তুমি দেখবে, লেখাপড়া একদম জানে না এরকম লোকও যখন মাত্র তিনটা দিন আল্লাহর রাস্তায় দেয়, তাকে নামাজের জন্য বলতে হয় না, সে আযান হলে আর বসে থাকতে পারে না। মিসওয়াক খুঁজে না পেলে তার কষ্ট হয়, ঢিলা কুলুখ সাথে না থাকলে ইস্তিঞ্জা করতে তার কেমন কেমন লাগে। দ্বীনের যে কোন কথা সে আমলের জন্য তৈরি। অথচ সে কোন ইসলামিক প্রোগ্রাম নিয়মিত দেখার সুযোগ পায় নি, দ্বীন সম্পর্কে লম্বা বিতর্কও সে করতে জানে না।

এই যে উভয় ধরনের মানুষের মাঝে পার্থক্য, তার কারন হলো একজন অল্প কিছু যা শিখেছে কষ্ট করে শিখেছে, এর জন্য সে মুজাহাদা করেছে। অন্যজন বিনা কষ্টে অনেককিছু জেনে গেছে ঠিক, কিন্তু তা জেনেছে আরামে আয়েশে, এসি রুমে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে।

আসলে দ্বীনের জন্য কষ্ট করা চাই, মুজাহাদা চাই। হেদায়াত পাওয়ার জন্যে নববী তরীকা চাই। এজন্যই ইমাম মালিক রহঃ যথার্থই বলেছেন,

لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها.

এই উম্মতের শেষ অংশের সংশোধন হবে না ঐ পদ্ধতিতে মেহনত ব্যতীত,যে পদ্ধতি সংশোধন ঘটিয়েছে উম্মতের প্রথম অংশের।

যতই তুমি বলো এখন আধুনিক যুগ, সেকেলে পদ্ধতি এখন বেকার, কেন এই ইন্টারনেটের যুগে এত কষ্ট করা, বাস্তবে নববী পদ্ধতির সেই মেহনত ছাড়া হেদায়াত আসবে না। তুমি হয়তো অনেক জানবে, কিন্তু আমল করতে পারবে খুব কম।

আমলের যোগ্যতা সে ভিন্ন জিনিস। হেদায়াত পাওয়ার জন্যে কষ্ট করা লাগবে। যুগ ডিজিটাল হলে কি হবে সুন্নাতুল্লাহর তো পরিবর্তন ঘটে নি।
এ আয়াত তো মানসুখ হয়ে যায় নি,
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
আমার রাস্তায় যে মুজাহাদা করবে, নিশ্চয়ই হেদায়াতের রাস্তাসমুহ আমি তার জন্যে খুলে দেবো।
মেহনত মুজাহাদাই হেদায়াতের রাজপথ। এজন্য তুমি কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের দেখো, সে দ্বীন শেখার জন্যে কত কষ্ট করে। ফলে দ্বীনের উপর চলা তার স্বভাবে পরিণত হয়। তার জিন্দেগীই দ্বীন বনে যায়। অথচ কোরআন হাদীসের উপর এই পড়াশুনা আরও অনেক জায়গায় হয়, কিন্তু সে দ্বীনদারী তাদের মাঝে পাওয়া যায় না।
মসজিদে তালীমের হালকায় তোমার দশ মিনিট বসতে ইচ্ছে করবে না, কিন্তু কোন টিভি চ্যানেল, কিংবা ল্যাপটপে ডাউনলোড করা স্কলারের লেকচার ঘন্টার পর ঘন্টা শুনলেও মন বিদ্রোহী হবে না। আসলে যেখানে নফস মজা পায়, সেখানে হেদায়াত অনেক দূরের বস্তু। আর যেখানে নফসের দলন হয়, সেখানেই এতেআ'তের বীজ রোপিত হয়।
হেদায়াত পেতে হলে নববী তরীকায় মুজাহাদার রাজপথে নামতে হবে। কারণ এটাই সুন্নাতুল্লাহ।
ولن تجد لسنة الله تبديلا.
তুমি আল্লাহ তায়ালার সুন্নত বা নিয়মের মধ্যে কোন পরিবর্তন পাবে না।
এজন্যই হজরতজী মাওলানা ইলিয়াছ রহঃ বলতেন, রেওয়াজী তরীকা সে রেওয়াজ তরক্কী করে গি, দ্বীন তরক্কী নেহী করে গি।
রেওয়াজি পদ্ধতিতে মেহনতের দ্বারা রেওয়াজ উন্নতি লাভ করবে, দ্বীন উন্নতি করবে না।
তাই হেদায়াত পাওয়ার জন্যে নববী পদ্ধতিতে মুজাহাদাপূর্ণ পুরোনো মেহনতই হতে হবে আমাদের অবলম্বন।
কাজেই কেন অহেতুক এদিক ওদিক দৃষ্টি ফেরানো, মজবুতির সাথে ধরে থাকি এই হীরের টুকরো মেহনত। তবেই তো তোমার জন্যে খুলে যাবে সৌভাগ্যের আসমানী দুয়ার।

কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি সাথীদের প্রতি -৯

প্রিয় ভাই,

কখনও কি এমনও হয় তুমি রিয়ার ভয়ে আমল করা ছেড়ে দাও? আজ ঠিক করেছি এ ব্যাপারেই বলবো।
নিশ্চয়ই ইখলাস অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা গুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ইখলাসকেই ঈমান বলেছেন। ইখলাস হাসিলের জন্য তাই সবসময়ই চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু ইখলাস নেই মনে করে আমল ছেড়ে দেয়া কখনোই ঠিক নয়। এ ব্যাপারে এক বুজুর্গ খুব সুন্দর বলেছেন। সম্ভবত হজরত হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহঃ কথাটি বলেছিলেন।
তিনি বলেন, মানুষ যখন কোন আমল শুরু করে তা রিয়াই হয়। কিন্তু যদি তা করতে থাকে, করতে থাকে, সেটি আদত বা অভ্যাসে পরিণত হয়। এরপরও তা ছেড়ে না দিয়ে যখন নিয়মিতভাবে করে, সেটি ইবাদতে পরিণত হয়। এরপরও যখন সে আমলটি ছেড়ে দেয় না, নিয়মিত করতে থাকে, সেটি ইখলাসে পরিণত হয়। কাজেই কেউ যদি প্রথম দিনই রিয়ার ভয়ে আমল ছেড়ে দেয়, সে তো কোনদিনই ইখলাসের নাগাল পাবে না।
কাজেই যখন শয়তান বুঝায়, আরে তুমি তো রিয়াকার, তোমার আমলে কি হবে! তখন নিজেকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা, আমি যে রিয়াকার তা তো আমি জানিই। মুখলিস হওয়ার জন্যেই তো আমি আমল করে যাচ্ছি। আমার মাঝে ইখলাস নেই বলে কি আমল করবো না? আজ বরং রিয়ার সাথেই করি।
এরপর যখনই কোন আমল শুরু করি, নিজেকে শুধাই, কেন তুমি এ আমল করছো? মানুষকে দেখানোর জন্যে? কিন্তু তুমি যেমন ফকির, সেও তো ফকির, সে তোমাকে এর কি বিনিময় দিতে পারবে?

তুমি কি রাস্তায় পাশাপাশি ভিক্ষায় রত দুই ফকিরকে দেখো নি? তারা কিন্তু কখনোই এ আশা করে না, পাশের ভিক্ষুক তার প্লেটে কিছু দেবে। কাজেই বোকার মতো অন্যকে দেখানোর জন্যে আমল করে কি লাভ!
হজরতজী মাওলানা ইউসুফ রহঃ বলতেন, " প্রতিটি আমলের শেষে এ জন্য ইস্তিগফার করা, আমি আমলটি ইখলাসের সাথে করতে পারি নি। ইসতিগফারের বদৌলতে একদিন আল্লাহ তায়ালা ইখলাস দিয়ে দেবেন।
প্রতিদিন কিছু আমল গোপনেও করা চাই, যেন আল্লাহ ও ফেরেস্তা ছাড়া আর কেউ না জানে। তুমি হজরত ইমাম জয়নাল আবেদীন রহঃ এর কথা কি তালীমে শুনো নি? তার সাহায্যে ত্রিশটা পরিবারের ভরণপোষণ চলতো। অথচ তা প্রকাশ হলো যখন তিনি মারা গেলেন। তাঁর জীবদ্দশায় কেউ তা জানলো না। হেদায়ার গ্রন্থাকার হেদায়া কিতাবটি লিখেছেন দীর্ঘ তের বছরে। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি প্রতিদিন রোযা রেখেছেন। অথচ তাঁর খাদেমও তা জানতে পারে নি। খাদেম দিনের বেলা খাবার নিয়ে আসলে রেখে যেতে বলতেন। খাদেম চলে গেলে সে খাবার কোন ছাত্রকে খাইয়ে দিতেন। খাদেম যখন পাত্র ফেরত নিতে আসতো, খালি পেয়ে মনে করতো তিনিই খেয়ে নিয়েছেন।
কাজেই তুমিও কিছু আমল গোপনে করার অভ্যাস বানাও। অন্য আমলে ইখলাস না থাকলেও এই আমলগুলোতে নিশ্চয়ই ইখলাস থাকবে।
নিজেকে কখনোই মুখলিস মনে করতে যেও না। নিজের গুনের মাঝেও দোষ তালাশ করতে থাকো। আর অন্যকে সবসময়ই মুখলিস জ্ঞান করতে থাকো। ভুলেও কারও ইখলাসের ব্যাপারে খারাপ ধারনা করো না। ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহঃ এর এক ঘটনা মশহুর আছে। একবার ছয়মাস তিনি তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন নি। এর কারণ তালাশ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, এক ব্যক্তিকে রোনাজারি করতে দেখে তিনি মনে করেছিলেন, মানুষকে দেখানোর জন্যে কাঁদছে। এরপর তিনি যখন তাওবা করলেন, আল্লাহ তায়ালা আবার আমলের তৌফীক দিয়েছিলেন।
আসলে কোন মুমিন কখনোই লোকদেখানো কোন আমল করে না। শুরুতে ইখলাসের সাথেই সে আমল শুরু করে । কিন্তু শয়তান তার নিয়তকে নষ্ট করার জন্যে ওয়াসওয়াসা ঢালতে থাকে। আমাকে শয়তানের এ কারসাজির ব্যাপারে সাবধান হতে হবে।
ইখলাসের জন্যে চাই বুজুর্গানে দ্বীনের জুতা সোজা করা। চলতি জামাতে প্রতিটি সাথীকে আল্লাহর নেক বান্দা জ্ঞান করে তাদের খেদমত করতে থাকা চাই। এমন কিছু কাজ থাকে যেগুলো নফস করতে চায় না। যেমন টয়লেট পরিস্কার করা, মসজিদ ঝাড়ু দেয়া, ইজতেমায়ী সামানা বহন করা। এ কাজগুলো নিজের ইসলাহর নিয়তে করতে থাকবো যেন দয়া করে রাব্বে কারীম আমাকে ইখলাস দিয়ে দেন।
আর চোখের পানি তো আছেই। দ্বীনের ক্ষেত্রে যার কোন বিকল্প নেই। আমার সমস্ত মেহনত বেকার হবে যদি তিনি দয়া না করেন।
ব্যস, এই কথাগুলো বার বার অন্যদের সাথে মুজাকারা করা চাই। আমাদের বড়গন বলেন, যে আমলের উপর উঠতে হয়তো আরও পঞ্চাশ বছর লাগবে তার আলোচনাও আজকে থেকে শুরু করা যেন তার উপর উঠা সহজ হয়।

কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি সাথীদের প্রতি -১০

প্রিয় ভাই,

দ্বীনের উপর চলতে গিয়ে কখনও যেন তোমার মাঝে নিজের পড়াশুনাকে তুচ্ছজ্ঞান করার মানসিকতা তৈরি না হয়। শয়তান অনেক সময় দ্বীনদার শ্রেণীকে তার দুনিয়ার প্রতি বেশি বিতৃষ্ণ করে তুলতে চায়। জায়েজ দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা তৈরি করে তাকে জাগতিক ব্যাপারে উদাসীন করে তুলে। দুনিয়ার ক্ষতি করিয়ে তাকে দ্বীন থেকে সরানোর কৌশল হিসেবে শয়তান তা করে থাকে। যখন এক সময় সে দেখে দুনিয়ার ক্ষেত্রে বেশি পিছিয়ে গেছে, তার মধ্যে দুনিয়া হাসিলের জেদ চেপে বসে। ফলে সে দ্বীন থেকে গাফেল হয়ে যায়। মেহনত করতে গিয়ে যখন তোমার মনে এ খেয়াল আসে, পড়াশুনা বেশি করে কি লাভ, কোনভাবে পাশ করলেই তো চলে, বুঝে নাও, শয়তান তোমাকে নিয়ে খেলছে।
নিজের পড়াশুনাকে কখনোই তুচ্ছজ্ঞান করতে যেও না। দুনিয়াবী জ্ঞান বিজ্ঞান হাসিল করা কখনোই দ্বীনদারীর পরিপন্থী নয়। বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে,
الحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق بها.
জ্ঞানবিজ্ঞান মু'মিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই তা পাওয়া যাবে, মু'মিনই এর সবচেয়ে বেশি হকদার।
কাজেই কখনোই তুমি এ কথা ভেবো না, তোমার এই ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পড়া, তোমার এই মেডিকেল সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া দুনিয়া। বরং তুমি তোমার এই পড়াশুনাকে আখিরাত বানাও।
আমাদের একজন স্যার আছেন। ডাঃ মাঈদুল ইসলাম স্যার। স্যার একবার আমাদের বলছিলেন, " আমি যদি মেডিকেলের বইগুলি পড়ি তখনও ওযুর সাথে পড়ি।"
যখন স্যারকে বলা হলো, ' কেন স্যার, এগুলো তো কোরআন হাদীস না।"
স্যার বললেন, " আমি তো আমার পড়াশুনাকে, আমার প্রফেশনকে আখিরাত বানিয়েছি। আমি তো এই পড়াশুনার দ্বারাও নেকীর আশা করি। তাই আমি মেডিকেলের বই পড়ার সময়ও ওযু করে নিই। "
দেখো, এই হচ্ছে বড়দের দৃষ্টিভঙ্গি। আর আমরা বোকার মতো একটাকে মনে করি দুনিয়া, আর একটাকে মনে করি আখিরাত। অথচ মু'মিনের সবই তো আখিরাত, সে এমন কিছু করতে পারে না, যা আখিরাতে কাজে আসবে না। যে নিয়ত করতে জানে, তার জন্য মুবাহ কাজও নেকীর কারন হয়ে যায়।
কাজেই তুমি যেন তোমার পড়াশুনাকেও দাওয়াত বানিয়ে নাও।
একবার আমাদের হোস্টেলে ঢাকা মেডিকেলের এক সিনিয়র জামাতে এসেছিলেন। তিনি আমাদের সাথে মুজাকারার সময় বললেন, " ছাত্রদের জন্য পড়াশুনাকে গুছিয়ে রাখা এমন, যেমন সাহাবাগন আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্যে নিজেদের ঘোড়া, নিজেদের হাতিয়ার ইত্যাদি রেডি করে রাখতেন। ঘোড়াকে ভাল মতো খাবার খাইয়ে মোটাতাজা করে রাখতেন, যেন জিহাদের ডাক এলে সওয়ার হয়ে যেতে পারেন।" তো তিনি বললেন, ছাত্রদের জন্য পড়াশুনাটা যেন সওয়ারী। পড়াশুনা গোছানো থাকবে, দ্বীনের যেকোন তাকাজা সে সহজে পূরণ করতে পারবে। পড়াশুনা রেডি না থাকলে তার জন্য তা সহজ হবে না।
কাজেই তোমার পড়াশুনা তোমার মেহনতেরই অংশ, কখনো নিছক দুনিয়া নয়।

কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি ভাইদের প্রতি -১১

প্রিয় ভাই,

আজকের আলোচনাটি কালকের মুজাকারারই ধারাবাহিকতা।পড়াশুনার ক্ষেত্রে কেন কিছুতেই অবহেলা করা যাবে না সে ব্যাপারেই আলোচনা হয়েছে গতকাল। শয়তান যে যুক্তি দিয়ে পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটায়, সে ধরনের আর কিছু খোঁড়া যুক্তি দিয়ে পেশাগত জীবনেও সমস্যা সৃষ্টি করে। অনেক ভাইকে দেখা যায়, হালাল উপার্জনে অলসতা করে।যদি তাকে বলা হয়, ভাই ব্যবসা করো, সে বলে, মহিলা কাস্টমারদের সাথে লেনদেন করবো কিভাবে? চাকরীর কথা বললে মহিলা স্টাফের উপস্থিতিতে নজরের হেফাজতে সমস্যা হওয়ার কথা বলে। অথচ এখন সময়টা এমনই, সব জায়গায় বেপর্দা মহিলাদের সয়লাব। এখন তাই বলে কি চাকরী ব্যবসা বাদ দিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে?
শরীয়তকে না বুঝার কারনেই এ সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়। সাথীটিকে দেখা যায়, পর্দার সমস্যা হবে বলে চাকরী করতে চায় না, এদিকে হালাল উপার্জন না করার কারনে অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়। অনেক সময় বড়ভাইয়ের কামাই খেতে থাকে, অথচ তিনি অসন্তুষ্টির সাথে তার খরচ বহন করছেন। অনেক সময় পিতার উপর বোঝা হয়ে থাকে। এভাবে তার পেটে হারাম প্রবেশ করতে থাকে। একদিকে সে সুফী, অন্যদিকে হারামভক্ষক।
সে অতিরিক্ত বুজুর্গীর কারনে হয়তো চাকরী করছে না, কিন্তু যে সব কাজে গুনাহর সম্ভাবনা নেই যেমন, মাটিকাটা, চাষাবাদ করা ইত্যাদি কেন সে করে না? এ সব করতে আবার তার আভিজাত্যে বাধে।
আসলে বাস্তবে শয়তান তাকে ধোকা দিয়ে অকর্মন্য বানিয়ে দিচ্ছে।
শরীয়ত এ কথা বলে নি, রাস্তায় বেপর্দা মহিলার আনাগোনা, সুতরাং রাস্তায় বের হওয়া যাবে না। বরং শরীয়ত বলেছে রাস্তার হক আদায় করতে, নজরকে নীচু রাখতে। এ কথা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
চাকরী আমাকে করতে হবে, কিন্তু সাথে দিতে হবে চোখের হেফাজতের পরীক্ষা। দোকানেও আমাকে বসতে হবে, সাথে করতে হবে নিজের নফসকে কঠোর নিয়ন্ত্রন।
আমাদের লম্বা সময় আল্লাহর রাস্তায় দেয়ার এটিই তো মাকসাদ। যেন আমি সর্বত্র আল্লাহ তায়ালার হুকুমকে জীবিত করতে পারি। আমি যখন চাকরীতে, ব্যবসায়, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, হাসপাতালে, চেম্বারে নজরের হেফাজত করে চলবো, তখনই তো তা দাওয়াত হবে। এটিই তো দাওয়াত ও আমালকে এক সাথে জমা করা। যেটিকে বলা হয়েছে আহসান তথা সর্বোত্তম দ্বীন। নীচের আয়াতের ব্যাখ্যা তো তাই।
ومن أحسن قولا ممن دعا الي الله وعمل صالحا....
মুফাস্সিরগন যাকে বলেছেন আহসানু দ্বীন।
আর টাকাপয়সা খুবই জরুরী বস্তু। টাকাপয়সা জরুরত পরিমাণ কামাই করা ছাড়া দ্বীনের উপর চলা কঠিন।এ জন্য আজ থেকে কত আগে ইমাম হজরত সুফিয়ান সাওরী রহঃ বলেছেন,
আমাদের হাতে যদি দীনার দিরহাম না থাকতো, এই সব বাদশাহগন আমাদের হাতের রুমাল বানিয়ে ফেলতো।
সে যুগে যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে এ যুগে কি রকম হবে? হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাঃ সম্পর্কে এ কথা প্রসিদ্ধ আছে, যখন তিনি দুনিয়ার কাজে মশগুল হতেন, মনে হতো এই ব্যক্তি দুনিয়া ছাড়া আর কিছু বুঝেন না। আর যখন আখিরাতের কাজে মশগুল হতেন, মনে হতো তিনি আখিরাত ছাড়া আর কিছু বুঝেন না।
অতএব তুমিও খুবই ভারসাম্য বজায় রেখে চলো। তবে ব্যবসা বানিজ্য ও চাকরীর ক্ষেত্রে অবশ্যই শরীয়তের সীমারেখা ঠিক রাখবে।

কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি ভাইদের উদ্দেশ্যে -১২

প্রিয় ভাই,

আজকের লিখাটি পড়ার আগে অবশ্যই তোমাকে গত দুটি পোস্ট সামনে রাখতে হবে। শয়তান কিভাবে তোমার দুনিয়া নষ্ট করে তোমাকে দ্বীন থেকে, দ্বীনের মেহনত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, তারই আলোচনা করা হয়েছিল সেখানে। আজ আমি আলোকপাত করার চেষ্টা করবো শয়তানের সেই ভয়ানক চক্রান্ত থেকে নিজেকে বাঁচানোর উপায় সম্পর্কে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই তৌফীকদাতা।
আমাদের বড়গন বলেন, শয়তানের এই চক্রান্ত থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ নিজেকে পরামর্শের পাবন্দ বানানো। আমাদের মেহনতের ইজতেমায়ী দিকগুলো যেমন পরামর্শ ছাড়া চলতে পারে না, তেমনই ব্যক্তিগত বিষয়গুলোও পরামর্শের অধীনে না আনলে পথচলা কঠিন। এজন্য নিজের কোন সিনিয়রকে নিজের মুশীর বানানো। নিজের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো তাঁর সাথে পরামর্শ করে ঠিক করা। নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই বিপদ।
মুশীর বানানোর জন্যে যে অনেক বড় কাউকে ঠিক করতে হবে তেমন নয়। তোমার সবদিক যার সামনে আছে, যিনি তোমার উপর কিছু মেহনতও করেছেন, তোমার কাজে জুড়ার পিছনে যার মেহনতের অংশ আছে, যিনি নিজেও পরামর্শ করে চলেন, যিনি দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়ে চলেন, তেমন একজন হলেই ভালো হয়। নিজের ক্যাম্পাসের কোন সিনিয়র ভাই, যিনি তোমার জন্য অন্তর থেকে মহব্বত রাখেন তেমন কেউ হলে তোমার জন্যও তাকে সবসময় কাছে পাওয়া সহজ। তুমি কখনও এ কথা মনে করতে যেও না, তিনি তো অনেক বড় বুজুর্গ কেউ নন। মুশীর হওয়ার জন্য দ্বীনি মেজাজ রাখেন, দাওয়াতের কাজের সাথে মুনাসাবাত রাখেন এবং যে বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হচ্ছে সে ব্যাপারে ধারনা রাখেন এ রকম কেউ হলেই চলবে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, এই সকল নিবেদিতপ্রাণ সিনিয়র অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় শায়খ থেকেও বেশি উপকারী হয়ে থাকেন। কোন বড় সমস্যা হলে বা নিজেকে অপারগ মনে করলে তাঁরা নিজেরাই তোমাকে আরও বড় যারা আছেন তাদের কাছে সোপর্দ করবেন। যখন কোন ব্যাপারে তারা নিজেকে অনুপযুক্ত ভাববেন, নিজ থেকেই তা বলে দেবেন। নিজের ক্যাম্পাসের কোন সিনিয়র হলে এ জন্যই সুবিধা যেহেতু তিনিও একই পথের পথিক, তিনিও যেহেতু একই সমস্যা ফেইস করে এসেছেন।
বিষয়টি যেন তোমার সহজে বুঝে আসে, সে জন্য আমার নিজেরই কিছু ঘটনা এখানে পেশ করছি।
আমার একদম মেডিকেলের ফার্স্টইয়ারে যখন আমি মাত্র তিনদিন লাগিয়েছি সে সময়ের ঘটনা।
আমি তখন মামার বাসায় থেকে পড়াশুনা করি। সামনে হোস্টেলে উঠে যাওয়ার চিন্তা করছি। বাবার আটারো শত টাকার পেনশন আমাদের ভাইবোনদের সবার খরচ চালানোর জন্য যথেষ্ট নয়। সবাই পরামর্শ দিচ্ছে টিউশনি করার জন্য। অনেকেই টিউশনির বিভিন্ন অফার পেশ করছে। আমি বিষয়টি নিয়ে পরামর্শের জন্য আমাদের মেডিকেলের মেহনতের জিম্মাদার মুহতারাম ডাক্তার ফরিদ ভাইয়ের কাছে চললাম। ভাইয়া তখন ফিফথ ইয়ারে। পুরো বিষয়টি ভাইয়া মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। এরপর খুবই দরদের সাথে ভাইয়া টিউশনি করার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। পড়াশুনা, দ্বীনের মেহনত, দ্বীনদারী সম্পর্কিত বিষয় সবকিছুই সামনে আনলেন। টিউশনি, নিজের পড়াশুনা আর মেহনত - তিনটা এক সাথে চালাতে গেলে যে কোন না কোন ক্ষেত্রে কমজোরি এসে যায় তা বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বুঝালেন। টিউশনিগুলো সাধারণত ডিল করেন ঘরের ভদ্রমহিলারা, ফলে পর্দা রক্ষা করতে না পারা ও নজরের হেফাজতে সমস্যা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এরপর আসে ছুটির সময়গুলো আল্লাহর রাস্তায় দেয়ার মাসআলা। প্রায় সময়ই টিউশনি বাধা সৃষ্টি করে, অথচ দ্বীনের ক্ষেত্রে আগে বাড়ার জন্য সময় লাগানোর বিকল্প নেই। আবার পড়াশুনা ঠিক রেখে প্রতিদিনকার মেহনতে সময় দেয়াও কঠিন হয়ে পড়ে।
ভাইয়া এই সব দিক আলোচনা করে আমাকে বললেন, আমার তো মনে হয়, টিউশনি করার চেয়ে প্রয়োজনে আলু ভর্তা খেয়ে দিন গুজরান করা উত্তম হবে। কয়েকদিন কষ্ট করলে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য চাইলে ইন শা আল্লাহ তিনিই রাস্তা খুলে দেবেন।
প্রথমে এই ছিল ভাইয়ার রায়। আমার উচিত ছিল এর উপরই উঠে যাওয়া। কিন্তু আমি ছিলাম একদম নতুন সাথী।টিউশনি না করে এভাবে পরিস্থিতি মুকাবিলা করা আমার পক্ষে কঠিন মনে হলো। আর লোকজনও আগে থেকেই আমার মাথায় টিউশনির পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ভাইয়া আমার পরিস্থিতি বুঝলেন। এরপর বললেন, তাহলে আপাতত সাময়িক করা যেতে পারে, কিন্তু উপরে যা আলোচনা করা হলো তা সামনে রাখতে হবে এবং যখন একটা বিকল্প ব্যবস্থা হয়ে যাবে টিউশনি ছেড়ে দিতে হবে। পরামর্শ করার কারনে টিউশনির অনেক দিক আমার সামনে এলো। আমি বাধ্য হয়ে টিউশনি শুরু করলাম। তবে তার জন্য সময় নির্ধারণ করলাম আড়াইটা থেকে আসরের আগ পর্যন্ত এবং অবশ্যই যেন আসর হোস্টেলে পড়তে পারি সেভাবে। দুপুর দুইটায় ক্লাস শেষ করে রেস্ট না নিয়ে টিউশনির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া ছিলো আসলেই কষ্টকর। কিন্তু বিকল্প কিছু ছিলো না। কারন সিডিউল এমনভাবে মেইনটেইন করতে হবে যেন আসর থেকে মাগরিব প্রতিদিনের মেহনত বাদ না যায়, আর রাতে পড়াশুনার জন্য সময় দিতে পারি। ফলে যে কোনভাবে আসর হোস্টেলে এসে পড়তাম, কখনও কখনও সি,এন,জি, যোগে এসে হলেও আসরের আগে এসে পড়তাম। কোনদিন টিউশনির কারনে আসর হোস্টেলে এসে পড়তে পারি নি বলে মনে পড়ে না। ফলে কোনদিন আসরবাদ তালীমও ছুটে নি, প্রতিদিনের মেহনতও ছুটে নি। লোভে পড়ে একটার বেশি টিউশনি করার চিন্তাও কখনও মাথায় আসে নি। টিউশনিতে ছাত্রী পড়ানোর কথা তো কল্পনাও করতে পারতাম না। অনেক সংকটের সময়ও বড় অংকের অফারে মেয়ে পড়াতে রাজী হই নি। ফাইনাল পরীক্ষাগুলোর পর লম্বা সময় লাগানোর জন্য প্রয়োজনে টিউশনি ছেড়ে দিয়েছি। আমার মনে আছে, প্রতিবারই আগের চেয়ে ভাল টিউশনি মিলেছে। ফার্স্ট প্রফের পর চিল্লা দিতে গিয়ে দুই হাজার টাকার টিউশনি ছাড়তে হয়েছে। ফিরে এসে তিন হাজার টাকার টিউশনি পেয়েছি। সেকেন্ড প্রফ শেষে আটারো দিন সময় লাগিয়েছি। ফলে আগের টিউশনি ছাড়তে হয়েছে। ফিরে এসে পাঁচ হাজার টাকার টিউশনি পেয়েছি। আল্লাহ তায়ালা কখনও সমস্যায় ফেলেন নি। আমার তো মনে হয়, এসব পরামর্শেরই বরকত ছিলো।

অনেক সময় এমন কঠিন পরিস্থিতিও আসে, যা একা সমাধান করা যায় না। আমার ফাইনাল প্রফের সময় এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। সৌভাগ্যক্রমে তখন আমাদের হাসপাতালে পুনরায় পোস্টিং হয়েছে সিএমসির দাওয়াতের মেহনতের দুই কিংবদন্তী মুহতারাম ডাঃ ফরিদ ভাই ও ডাঃ রোকনোজ্জামান সেলিম ভাইয়ের। ডাঃ নুরুল হক ভাইয়ের তখন ইন্টার্ণশীপ চলছে। ফরিদ ভাই, সেলিম ভাই আমার এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রানান্তকর চেষ্টা করেছেন। নুরুল হক ভাই সাহস দিয়েছেন। হাসমত ভাইয়ের সাহায্যের কথাও মনে আছে। সেদিন যদি আমার এই বড় ভাইগন কাছে না থাকতেন, না জানি কোন অকুল পাথারে পড়তাম।কঠিন হতাশা তখন আমাকে গ্রাস করেছে। বিভিন্ন নেগেটিভ চিন্তা মাথায় ভিড় করেছে। আল্লাহ তায়ালা আমার এই বড় ভাইগনের পরামর্শ ও নিগরানীর বদৌলতে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁরা পাশে না থাকলে হয়তো আমি এমন কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতাম, যা আমার ক্যারিয়ারের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতো।

কাজেই কখনোই একা সিদ্ধান্ত নিতে যেও না। বড়দের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে চলতে অভ্যস্ত হও। আল্লাহ তায়ালা পদস্খলন থেকে হেফাজত করবেন।

কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি ভাইদের উদ্দেশ্যে -১৩

প্রিয় ভাই,

গত কয়েকদিন ধরেই তোমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু না কিছু লিখছি।শুনতে যদিও নসীহতের মতো শুনায়, আমি কিন্তু খুব ভাল করেই জানি তুমি কেবলই উপলক্ষ।আমার ভেতরের বেয়োড়া 'আমিটা'র জন্যেই আসলে এত কিছু বলা।আর তোমাকে যখন দেখি প্রচন্ড প্রতিকুলতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দ্বীনের উপর চলো, আমার সেই সোনালী কলেজ জীবনকেই মনে পড়ে যায়। দিল থেকে আমার মাওলার জন্যে শোকরিয়ার বৃষ্টি নামে। আমার তখন খুব ইচ্ছে করে আবার সেই অতীতে ফিরে যাই। ইচ্ছে করে, আমার সে সময়ের অসঙ্গতিগুলো ঠিক করে নিই।ইচ্ছে করে আরো সুন্দর করে সে জীবনটা আবার শুরু করি। কিন্তু মাওলা সময়কে কেবল সামনে চলার অনুমতি দিয়েছেন। তাই সে কেবল এগিয়ে চলে, পেছনে ফিরে তাকাতে সে জানে না।
অতীতকে আবার নতুন করে বিনির্মাণে আমার এ অক্ষমতায় কেবল তুমিই অবলম্বন। তাই তোমাকে সম্বোধন করে আমি নিজের আগামীকে ত্রুটিমুক্ত করতে চাই।
ভাই, আজ একটু নামাজের কথা বলি। যে কথাগুলি আমি বার বার নিজেকে শুনাতে চাই। যে রকম নামাজী হতে পারা আমার আজীবনের স্বপ্ন।
আমার দাওয়াতের কিছু অসঙ্গতিই আজ তুলে ধরি। চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে নামাজের ফাযায়েল আছে যে হাদীসটিতে সেটির আবেদনকে ফিকে করে দেয়া নিয়ে কথা। মনে হয় অনেক সময় এভাবে দাওয়াত তুমিও দাও। চল্লিশদিন তাকবীরে উলার সাথে নামাজ পড়লে দুটি সার্টিফিকেট- মুনাফিকদের লিস্ট থেকে নাম কাটা যাবে, নাম কাটা যাবে জাহান্নামীদের লিস্ট থেকেও।
হাদীসের মাফহুম তো এমনই। কিন্তু আমরা এ হাদীস বলি চিল্লার তাশকীল করতে গিয়ে। বলার ঢঙ্গটা অনেকটা এমন, চল্লিশদিন তাকবীরে উলার সাথে নামাজ তো এলাকায় পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় গেলে সহজ।ফলে দেখা যায়, আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে ছত্রিশতম দিনে কারও তাকবীরে উলা মিস হলো। তার কি যে আফসোস! কি যে কান্না!
বিশাল সৌভাগ্য হাত ফসকে ছুটে গেছে। না, আমার ইশকাল এখানে নয়। আমার অভিযোগ হলো, তাকবীরে উলার জন্যে কান্নারত এই ভাইটি যখন এলাকায় ফিরে আসে, নামাজের এই দরজার ইহতিমাম তার মাঝে আর থাকে না। বরং মাসবুক হওয়াটাই তার সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়। আর তাকবীরে উলার জন্যে তার হা পিত্যেসই বা বাকী থাকবে কেন। তার ইয়াকীনই হলো মহল্লায় এক নাগাড়ে চল্লিশদিন সম্ভব নয়। কাজেই যা অসম্ভব তার জন্য কেন বৃথা চেষ্টা করা।মানুষ তো ঐ জিনিসের জন্য চেষ্টা করে, যা হাসিল করা সম্ভব। যেটিকে আকাশের চাঁদের মতো নাগালের বাইরে মনে করে, তা ধরার চেষ্টা কোন বোকা করবে!
হজরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহঃ। বিখ্যাত তাবেয়ী। তিনি যয়তুন তেলের ব্যবসা করতেন। হাদীসের দরস দিতেন। মানুষের শত জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন। তারপরও এত ব্যস্ত মানুষটি দীর্ঘ বিশ বছর আযানের আগেই মসজিদ হাজির হয়েছেন। প্রতিটি নামাজ প্রথম কাতারে পড়েছেন।এই হলো নামাজের ক্ষেত্রে তাঁর ইস্তিকামাত।
বন্ধু, যদি নামাজের ক্ষেত্রেই আমি একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে পোঁছতে না পারি, তো আর কোন ক্ষেত্রে আমি পারবো? আমার নামাজের অসঙ্গতিই বলে দেয় আমার দ্বীন কত অসম্পূর্ণ। ইস্তিকামাতের কিছুই আমি হাসিল করতে পারি নি। অতএব, নামাজের ব্যাপারে আমি সিরিয়াস হই। যদি আমার তাকবীরে উলা ছুটে যায়, আমি মনে করতে থাকি আমার পেছনে একটা বাঘ লেগে গেছে। সেটি যে কোন মূহুর্তে আমার উপর হামলে পড়বে। আর যদি আমার জামাত ছুটে যায়, আমাকে মনে করতে হবে, আমার তো সব শেষ। আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। মেহনতের প্রাথমিক তাকাজাও যে আমার এখনও পুরো হয় নি।
ক্লাস বলো, আর এক্সাম বলো, কোনটাই যেন তোমার জামাতে নামাজের প্রতিবন্ধক না হয়। প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে আগাম পরামর্শ করে নিতে হবে জামাত কখন, কোথায় পড়া হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষার হলে, কিংবা ওয়ার্ডে, অথবা ওটি রুমে।
যে নিজেকে দাঈ মনে করে, সে কি অবহেলায় জামাত তরক করতে পারে? নামাজের সময় হলে তার তো সব ভুলে যাওয়ার কথা। আযানের ডাক তো সব ছাড়ার ডাক। মাওলা তোমাকে ডাকছে। তুমি কাকে নিয়ে ব্যস্ত?

কলেজ ও ভার্সিটি পড়ুয়া তাবলীগি ভাইদের উদ্দেশ্যে -১৪

প্রিয় ভাই,
আজ খুব খুশী লাগছে টানা তৃতীয় সপ্তাহে শবগুজারীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পেরে। ছাত্রজীবনে যখন হোস্টেলে থাকতাম, জুমারাত মারকাজে যেতে না পারলে ঘুমই হতো না। কিন্তু যেদিন থেকে হাটহাজারী চলে এসেছি, আগের মতো প্রতি সপ্তাহে হিম্মত করতে পারি না। পথের দূরত্ব, রাস্তার অসহ্য জ্যাম আমাকে অক্ষম করে দেয়। এখনও দূরত্ব আগের মতোই আছে। আগের চেয়ে বেড়ে গেছে রাস্তার জ্যাম। পৌনে ঘন্টার পথ কখনও কখনও তিনগুন হয়ে যায়। তারপরও এক ধরনের ভাললাগা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সেই নূরানী পরিবেশের হাতছানি পথের সমস্ত কষ্টকে হালকা করে দেয়। মারকাজে ঢুকতেই নিজের অস্তিত্বকে যেন টের পাই। আর যখন আমাদের সিএমসির ছাত্রদের সাথে বসি, আমার বয়সই কমে যায় পনের বছর।
এই ফেতনার সর্বগ্রাসী ঢলের মাঝে মারকাজের এই পরিবেশ আমাকে আশাবাদী করে তোলে। মনে হয়, স্রোতের বিপরীতে নৌকা ছেড়ে দেয়া মাঝি কেবল আমি নই।
ভাই, ছাত্রজীবনের এই বন্ধনহীন মূহুর্তগুলোতে তুমি কিছুতেই এই নিয়ামতকে অবহেলা করো না। যাক না কেটে জীবনের কিছু রাত এভাবে এই নূরানী শামিয়ানার নীচে, কিছু দ্বীন পাগল মুমিনের সান্নিধ্যে। অসংখ্য আল্লাহওয়ালার এমন সমাগম তুমি আর কোথায় পাবে!
ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে। যখন পরীক্ষার ঝামেলা থাকতো, তখনও পড়াশুনা শেষে রাত বারোটায় হলেও মারকাজে হাজিরা দিতাম। সামান্য ঠান্ডা হয়ে যাওয়া পাতিলের তলানীর সেই বিরিয়ানী অমৃত মনে হতো।যখন পড়াশুনার চাপ থাকতো না, তখন তো জোর করেও পড়ায় মন বসাতে পারতাম না। মনে হতো, আমি হোস্টেলে, না জানি মারকাজে নবীর কোন মীরাছ বন্টন হয়ে যাচ্ছে, আর আমি হয়ে আছি মাহরুম। মাঝে মাছে প্রফের সময়গুলোতেও মন দিওয়ানা হয়ে উঠত। বই-খাতা ছেড়ে ছুঁড়ে, আমাদের গর্বের বেডিং কাঁধে ঝুলিয়ে কখনও লুঙ্গি পড়েই রওয়ানা হয়ে যেতাম। আজও তাই লুঙ্গি পরেই রওয়ানা করেছি সেই হারানো স্বাদ আস্বাদনের আশায়।
পুরো সপ্তাহের সমস্ত জুলুমাত যেন এক লহমায় ধুয়ে যেত।জং ধরা রুহখানা ঐশী গোসল শেষে পবিত্রতার আমেজ মেখে পরদিন হোস্টেলে ফিরতো। তোমাকে আমি কিভাবে বুঝাই সেই পবিত্র বিনোদন।
তুমি যদি হোস্টেলে থাকো, কাছেই যদি পেয়ে যাও কোন মারকাজ, তবে নিজেকে মাহরুম করো না। নিজেকে কল্পনা করো সাহাবাদের কাফেলায়। তাদের সাথে যেন তুমিও চলছো সারা পৃথিবীর আলো বঞ্চিত মানুষগুলোকে লুন্ঠন হাতে আলো বিলাবে বলে।
তোমার এই কদমগুলো চলে যাক জান্নাত অভিমুখে।আকাশের ফেরেস্তারাও ঈর্ষা করুক তোমার এই হরকতে ।